The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXV, 2019 (pp. 79 - 90)
Published in December, 2023

মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের নবরূপ "ভারত প্রেমকথা"

ড. শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ *

প্রতিপাদ্যসার

মহাভারত প্রাচীন মহাকাব্য। এ মহাকাব্যে নানা কাহিনি, নানা উপাখ্যান, উপদেশ, অনুশাসন রয়েছে। যা একটি সামাজিক সাহিত্য হিসেবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতব্যক্তিসহ সাহিত্যিকরা উল্লেখ করেছেন। এ মহাকাব্য ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্মচেতনার পাশাপাশি অজস্র প্রেম কাহিনির শ্রেষ্ঠ ঐশ্ব হিসেবে অন্যতম। সেই প্রেমকাহিনির উপাখ্যানগুলোকে আধুনিক আঙ্গিকে নিজের ভাষায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুবোধ ঘোষ পাঠক সমাজে উপহার দিয়েছেন 'ভারত প্রেমকথা'। বৈচিত্র্যের দিক থেকে মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানগুলো বিস্ময়কর। উপাখ্যানগুলো প্রণয়তত্ত্বের মনোবিশ্লেষণেও অভিনব। সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ইত্যাদি লোকসমাজের অতিপরিচিত উপাখ্যানগুলো ছাড়াও এমন আরও বহু উপাখ্যান মহাভারতে আছে, যেগুলো পাঠকসমাজে তেমন কোনো প্রচার লাভ করেনি। এসব অল্প-প্রচারিত উপাখ্যানও প্রেমের রহস্য বৈচিত্র্য ও মহত্ত্বের এক একটি বিশেষ রূপের পরিচয়। 'ভারত প্রেমকথা'র বিশটি গল্প এই রকমই বিশটি মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের পুনর্গঠিত রূপ। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ছাড়াই মহাভারতের ক্লাসিক রূপ ও ভাবের ভাণ্ডার থেকে আহৃত উপাদান নিয়ে রচিত এই নতুন গল্পগুলো আধুনিক সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। উপাখ্যানের মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ন রেখে এবং মূল বক্তব্যকে স্পষ্টতর অভিব্যক্তি দান করার জন্যই মাঝে মাঝে নতুন ঘটনা কল্পিত হয়েছে। প্রতিটি কাহিনি লেখকের মনীষা ও শিল্পনির্মিতির পরিচয় বহন করছে। বহন করছে নর-নারীর প্রেম যে এক সুসহ রহস্য– এই চিরন্তন সত্যটি। মহাভারতের অজস্র কাহিনির মধ্যে আমাদের জানা-অজানা, পরিচিতি-অপরিচিত কাহিনিগুলোর কেবল ব্যাখ্যা প্রদান নয় বরং পুরাণের প্রচলিত কাঠামো ভেঙে লিখেছেন 'ভারত প্রেমকথা'। ফলে এটি কেবল পুনর্লিখন নয়, হয়ে উঠেছে পুনঃসৃষ্টি। মহাভারতীয়

*সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রেমোপাখ্যানের নবরূপ ''ভারত প্রেমকথা'' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে মহাভারতের কাহিনির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে প্রেম সম্পর্কে লেখকের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) কল্লোল-উত্তর যুগের অন্যতম কথাসাহিত্যিক। ছোটগল্প দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর পদচারণা শুরু হলেও তিনি উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে শুধু সাহিত্য নয়, সামরিক বিদ্যা, পুরাতত্ত্ব কিংবা নৃবিদ্যাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। গভীর আর্থ - সামাজিক চেতনা, প্রখর বাস্তববোধ ও অভ্রান্তবোধ তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুবোধ ঘোষ লিখেছেন ১৫৭টি গল্প, ৩০টি উপন্যাস। এছাড়া রচনা করেছেন নাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা। তাঁর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থের নাম– "ভারত প্রেমকথা"(১৩৬২)। মহাভারতের প্রেমকাহিনি অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত।

১৯৫৬ সালে প্রকাশিত 'ভারত প্রেমকথা' মহাভারতের কাহিনির পুনঃনির্মাণ, বলা যায় পুরাণের প্রচলিত বক্তব্যের নতুন ব্যাখ্যা। তবে বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব মধ্যযুগ থেকে লক্ষ্য করা যায়।
ব্যক্তির ও সমাজের মন এবং সম্পর্কের যে-সব সমস্যা মহাভারতীয় উপাখ্যানগুলির মূল বিষয়, সে-সব সমস্যা বিংশ শতাব্দীর নরনারীর জীবন থেকেও অন্তর্হিত হয়নি। নরনারীর প্রণয় ও অনুরাগ, দাম্পত্যের বন্ধন বাৎসল্য ও সখ্য– শ্রদ্ধা ভক্তি ক্ষমা ও আত্মত্যাগ ইত্যাদি যে-সব সংস্কারের উপর সামাজিক কল্যাণ সৌষ্ঠব মূলত নির্ভর করে, তার এক-একটি আদর্শোচিত ব্যাখ্যা এইসব উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকার জীবনের সমস্যার ভিতর দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। শত শত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের যে-সব কাহিনী মহাভারতে বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে এই বিংশ শতাব্দীর যে-কোনও মানুষ তাঁর নিজের জীবনেরও সমস্যার অথবা আগ্রহের রূপ দেখতে পাবেন। এই কারণে শতেক যুগের কবিদল মহাভারত থেকে তাঁদের রচনার আখ্যানবস্তু আহরণ করেছেন (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, মুখবন্ধ)।

সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেমকথা' গ্রন্থের ২০টি প্রেমোপাখ্যান ব্যাসকৃত *মহাভারতে*র যে পর্বের যে অধ্যায়ে উপাখ্যানগুলোর মূল পরিচয় উল্লিখিত আছে তা হলো–
পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা (বনপর্ব, অধ্যায় ১৯২), সুমুখ ও গুণকেশী (উদযোগপর্ব, অধ্যায় ১০৪), অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা (বনপর্ব, অধ্যায় ৯৬), অতিরথ ও পিঙ্গলা (শান্তিপর্ব, অধ্যায় ১৭৪), মন্দপাল ও লপিতা (আদিপর্ব, অধ্যায় ২২৯), উতথ্য ও চান্দ্রেয়ী (অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৫৪), সংবরণ ও তপতী (আদিপর্ব, অধ্যায় ১৭১), ভাস্কর ও পৃথা (বনপর্ব, অধ্যায় ৩০৫), অগ্নি ও স্বাহা (বনপর্ব, অধ্যায় ২৪), বসুরাজ ও গিরিকা (আদিপর্ব, অধ্যায় ৬৯), গালব ও মাধবী (উদযোগপর্ব, অধ্যায় ১১৫), রুরু ও প্রমদ্বরা (আদিপর্ব ৯), অনল ও ভাস্বতী (সভাপর্ব, অধ্যায় ৩১), ভৃগু ও পুলোমা (আদিপর্ব, অধ্যায় ৫), চ্যবন ও সুকন্যা (বনপর্ব, অধ্যায় ১২২), জরৎকারু ও অস্তিকা (আদিপর্ব, অধ্যায় ১৩), জনক ও সুলভা (শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৩২১), দেবশর্মা ও রুচি (অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৪০), অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা (অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৯), ইন্দু ও শ্রুবাবতী (শল্যপর্ব, অধ্যায় ৪৯) (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, পরিশিষ্ট)।

'ভারত প্রেমকথা'র প্রত্যেকটি কাহিনি বিশ্লেষণ করে সুবোধ ঘোষের মনীষার ও শিল্পকৌশলের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এক পত্রে লেখককে লিখেছিলেন 'ভারত প্রেমকথা' 'এক বিস্ময়জনক সৃষ্টি'। এছাড়া তিনি মহাভারতের বৈশিষ্ট্য ও মহাকাব্যের প্রেম কাহিনি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন।

মহাভারতের সবকিছুর মধ্যেই কাহিনি ও চরিত্রের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। এর নৈসর্গিক রহস্য ও মেরুজ্যোতির অভ্যন্তরে কাহিনি আছে, সমুদ্র বাড়বানলের অন্তরালে কাহিনি আছে, সপ্তাশ্বযোজিত রথে আসীন সূর্যের উদয়াচল থেকে শুরু ক'রে অস্তাচল পর্যন্ত অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনি আছে। মহাভারতীয় কাহিনির নায়ক-নায়িকার নাম হল ভারতের শত শত গিরি পর্বত নদ নদী ও হ্রদের নাম। ভারতীয় শিশুর নাম-পরিচয়ও মহাভারতীয় চরিত্রগুলির নামে নিষ্পন্ন হয়। মহাভারতের এই জনপ্রিয়তার কথা সুবোধ ঘোষের গল্প বুননে প্রভাব ফেলেছিল। কারণ ''ব্যক্তির ও সমাজের মন এবং সম্পর্কের যে-সব সমস্যা মহাভারতীয় উপাখ্যানগুলির মূল বিষয়, সে-সব সমস্যা বিংশ শতাব্দীর নরনারীর জীবন থেকেও অন্তর্হিত হয়নি" (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, মুখবন্ধ)। এজন্যই তিনি প্রাচীন কাহিনিকে আধুনিক মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে নবনির্মিত রূপে উপস্থাপন করেছেন।

পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা

'পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা'র কাহিনিতে প্রতারক নারীর মনোজগতের পরিবর্তন ও প্রেম উন্মেষের রূপ চিত্রিত হয়েছে। মহাভারতে রয়েছে, পাণ্ডবেরা বনবাসকালে মার্কণ্ডেয়'র কাছে শুনেছিলেন পরীক্ষিৎ ও সুশোভনার কাহিনি। বিস্তৃত পরিসরের এই ঘটনাধারা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সুবোধ ঘোষ কাহিনিকে নতুন মোড়কে সাজিয়েছেন (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৪৯৭)।

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন–'পরীক্ষিৎ ও সুভোশনা' কাহিনীর সুশোভনার চেয়ে অধিকতর মডার্ণ উয়োম্যান তো বাংলা সাহিত্যে দেখি নাই।...প্যাশন-এর তড়িৎপুঞ্জচালিত সুশোভনা উল্কাপিণ্ডের ন্যায় মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায়, জ্বলন্ত বর্তিকার ন্যায় দুঃসহ। স্বাধীন, দুর্ধর্ষ, দুর্বার, সহজ জীবনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়াবেগের প্রবল উত্থানপতনও বোধ করি লোপ পাইয়াছে' (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, ভূমিকা)।

সুমুখ ও গুণকেশী

নারী তার হৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে লাভ করতে মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে পারে 'সুমুখ ও গুণকেশী'র কাহিনিতে তারই চিত্রণ রয়েছে(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৭৮৫-৭৮৬)।

সুমুখ ছিলেন ঐরাবত নাগের বংশজাত চিকুরের পুত্র ও ইন্দ্রের সারথি মাতলির কন্যা গুণকেশীর পতি। গুণকেশীর জন্য যোগ্য পতি খুঁজতে মাতলি দেবর্ষি নারদকে নিয়ে নানান জায়গায় ঘুরেছিলেন। অবশেষে অনন্ত নাগ বাসুকির পুরীতে গিয়ে একটি সুদর্শন নাগকে দেখে তাঁর পছন্দ হলো। নারদের কাছে মাতলি জানলেন যে, সেই নাগটি হলো ঐরাবত নাগের বংশজাত আর্যকের পৌত্র সুমুখ। মাতলি যখন সুমুখের হস্তেই কন্যাকে সম্প্রদান করবেন ঠিক করলেন, তখন আর্যক বললেন যে, সুমুখের পিতা চিকুরকে গরুড় ভক্ষণ করেছে এবং এক মাস পরে সুমুখকেও গরুড় ভক্ষণ করবেন স্থির করেছে। একথা শুনে মাতলি সুমুখকে নিয়ে ইন্দ্রের কাছে গেলেন। বিষ্ণু সেখানে ছিলেন। সব শুনে তিনি ইন্দ্রকে বললেন সুমুখকে অমৃত পান করাতে। বলা হয় ইন্দ্র বর দিলেন সুমুখ দীর্ঘায়ু হবেন। তখন আশ্বস্ত হয়ে মাতলি গুণকেশীকে সুমুখ হস্তে সম্প্রদান করলেন। সুমুখ দীর্ঘায়ু পেয়েছেন জেনে গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন যে, ইন্দ্র গরুড়কে নাগভোজনের বর দিয়ে এখন তাতে বাদ সাধছেন কেন। গরুড়কে রুষ্ট দেখে ইন্দ্র বললেন যে, তিনি নন– বিষ্ণু সুমুখকে অভয় দিয়েছেন। উত্তর শুনে গরুড় আরও ক্রুদ্ধ হলেন। বিষ্ণু, যাঁর ভার গরুড় অতি সহজে বহন করেন, তিনি কী করে তাঁর ভোজনে বাধা দিতে পারেন! বিষ্ণুর সম্মুখে গিয়ে গরুড় নিজের বল নিয়ে আস্ফালন করতেই, বিষ্ণু তাঁর বাম বাহুর ভার গরুড়ের ওপর রাখলেন। সেই ভারে গরুড় হতচেতন হয়ে পড়লেন। চেতনা পেয়ে গরুড় বিষ্ণুর কাছে ক্ষমা

ভিক্ষা করলেন। বললেন, তিনি শুধু বিষ্ণুর ধবজবাসী পক্ষী মাত্র বিষ্ণু যে অত বলশালী তিনি তা জানতেন না। বিষ্ণু তখন সুমুখকে গরুড়ের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। গরুড়ের কাছে সুমুখের আর কোনও ভয় রইলো না। এই কাহিনিতে সুমুখ ও গুণকেশী কেবল স্বামী-স্ত্রী এবং নারদ ও ইন্দ্রের সমবেত প্রয়াস তাঁদের দাম্পত্য জীবনকে রক্ষা করে।

মহাভারতের এই কাহিনি থেকে উপকরণ নিয়ে সুবোধ ঘোষ সম্পর্কটিকে মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। সুমুখ ও গুণকেশীর দাম্পত্য জীবন নয়, কাহিনির মূল বিষয় প্রাক্‌বিবাহ কালীন নর-নারীর সম্পর্কে প্রণয় মহিমার অন্বেষণ।

অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা

দাম্পত্য জীবনে বংশরক্ষার তাগিদে পুরুষ ভুলে যায় হৃদয়ের উত্তাপকে। কিন্তু নারী চায় পুরুষের প্রেম, তাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারায় রয়েছে সম্পর্কের বাঁধন (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৪০২-৪০৩)।

'অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা' এমনই এক কাহিনি, যেখানে ব্রতচারীর হৃদয়ের আড়াল থেকেও উদ্‌ঘাটিত হয় প্রেম। মহাভারতের বনপর্বে অগস্ত্য মুনির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিখ্যাত মুনি। লোমশ মুনি পাণ্ডবদের সঙ্গে ভ্রমণ করতে করতে অগস্ত্যের আশ্রম মণিমতী পুরীতে এসে লোপামুদ্রার গল্প বলেছিলেন। লোপমুদ্রা ছিলেন বিদর্ভরাজের কন্যা। তিনিও একজন তপস্বিনী ছিলেন। তাঁদের পুত্রের নাম দৃঢ়স্যু (অপর নাম ইধ্মবাহ) এই পুত্র পরে মহাকবি ও বেদজ্ঞ হয়েছিলেন।

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন– 'অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রার তপস্বিনী মূর্তিতেই আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু তাহার চরিত্রেও যে আরও একটা দিক আছে সুবোধবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। সে চিরন্তনী নারী। অলংকার-পরিত্যাগে সে কী দুঃখ। আবার অলংকার-লোভেই বা কী আগ্রহ। কিন্তু স্বামী যখন বহুবাঞ্ছিত অলংকাররাশি তাহার পায়ের কাছে আনিয়া স্তূপীকৃত করিল, তখন সেইগুলির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। চিরন্তনী ছলনাময়ীর এ কেমন চিরন্তন ছলনা। ঐ নীলাটুকু নারী-চরিত্রে আছে বলিয়াই বোধ করি মানুষের সংসারে নারীর প্রেম সুন্দর ও সুসহ এক রহস্য' (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, ভূমিকা)।

অতিরথ ও পিঙ্গলা

ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে বাঞ্ছিতকে পাবার সুখ লাভ করতে চায় নারী, এমনই এক কাহিনির সন্ধান পাওয়া যায় 'অতিরথ ও পিঙ্গলা'র কাহিনিতে। বহুগামিনী বারবণিতা এবং প্রেমময়ী নারীর মধ্যবর্তী ফাঁকটুকু সুবোধ ঘোষ যেন ভরাট করে দেন তাঁর কাহিনিতে (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৪, ৬৬১)।

অবন্তির এক গণিকা পিঙ্গলার পরিচয় পাওয়া যায় পুরাণে। ঋষভ মুনির প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণের ফলে পরজন্মে রাজা চন্দ্রাঙ্গদের মেয়ে কীর্তিমালিনী হয়ে জন্মায় এবং ভদ্রায়ুর সঙ্গে বিয়ে হয়। পুরাণের এই গণিকা পিঙ্গলাকে নিয়ে সুবোধ ঘোষ এক কল্পিত কাহিনি রচনা করেছেন।

মন্দপাল ও লপিতা

প্রেম ও ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণে নারী স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 'মন্দপাল ও লপিতা' কাহিনিতে।

মহাভারত অনুসারে মন্দপাল এক তপস্বী, যিনি পুত্রহীন হওয়ায় মৃত্যুর পর পিতৃলোকে স্থান পাননি। যাতে শীঘ্র পুত্রলাভ হয় এজন্য তিনি শার্ঙ্গক পক্ষীর রূপধারণ করে খাণ্ডব বনে এসে জারিতা নাম্নী এক শার্ঙ্গিকার গর্ভে চারটি পুত্র উৎপাদন করেন। তারপর তরুণী পত্নী লপিতার কাছে ফিরে যান। জরিতা মহর্ষি কর্তৃক পরিত্যক্ত ঋষিপুত্রদের পরিত্যাগ করতে না পেরে প্রাণপণে তাঁদের পোষণ করে খাণ্ডব বনেই বাস করতে লাগলেন।

খাণ্ডবদাহনের সময়ে মন্দপাল লপিতাকে নিয়ে খাণ্ডব বনে বিচরণ করার সময়ে পুত্রসহ তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির এক পর্যায়ে দুঃখ করলেন যে, পতিপরায়ণ স্বামীরাও পুত্রবতী হলে পতিদের প্রতি আর অনুরক্তা থাকে না। এই কথা শুনে মন্দপালের পুত্ররা পিতাকে তাঁদের পুত্রভক্তি প্রদর্শন করলেন। মন্দপাল জারিতাকে বললেন যে, সপত্নীর সঙ্গে বিবাদ করলে পরলোকের ক্ষতি হয়(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ২২৫)।

উতথ্য ও চান্দ্রেয়ী

ঋষি উতথ্য অঙ্গিরার পুত্র। চন্দ্রের কন্যার সঙ্গে যখন উতথ্যের বিবাহ হলো, তখন বরুণ খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। কারণ বরুণের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল চান্দ্রেয়ীকে বিবাহ করার। একদিন চান্দ্রেয়ী যখন যমুনায় স্নান করছেন, তখন বরুণ সুযোগ পেয়ে চান্দ্রেয়ীকে জোর করে জলের ভেতরে তাঁর নিজের পুরীতে নিয়ে গেলেন। সেই অপূর্ব সুন্দর পুরীতে তিনি চান্দ্রেয়ীর সঙ্গে পরম সুখে দিন যাপন করতে লাগলেন। দেবর্ষি নারদ সেই খবর জেনে উতথ্যকে অপ্রিয় সংবাদটি দিলেন। উতথ্য নারদকে বললেন বরুণকে গিয়ে বলতে যে, বরুণ লোকপালক হয়ে এই অন্যায় কাজ কেন করেছেন। চান্দ্রেয়ী উতথ্যের ভার্যা, তাঁকে অবিলম্বে উতথ্যকে প্রত্যর্পণ করতে। নারদ সঙ্গে সঙ্গে বরুণকে গিয়ে উতথ্যের কথাগুলি জানালেন। বরুণ নারদকে বললেন উতথ্যকে গিয়ে বলতে যে, সুন্দরী চান্দ্রেয়ী বরুণের প্রিয়া, তাঁকে বরুণ পরিত্যাগ করতে রাজি নন। নারদ ফিরে এসে উতথ্যকে বললেন যে, তিনি বরুণকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বরুণ উতথ্যের ভার্যাকে প্রত্যর্পণ করতে রাজি নন। উতথ্য সেই শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর সমস্ত জল পান করতে শুরু করলেন। বরুণকে সুহৃদরা উপদেশ দিলেন চন্দ্রের কন্যাকে পরিত্যাগ করতে, কিন্তু বরুণ সম্মত হলেন না। কিন্তু উতথ্য যখন বরুণের পুরীর ভেতরের হ্রদগুলোকেও জলশূন্য করতে শুরু করেছেন, তখন বরুণ ভীত হলেন। চান্দ্রেয়ীকে নিয়ে এসে উতথ্যকে দিয়ে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু উতথ্যের কাছে ফিরে যাবার ব্যাপারে চান্দ্রেয়ীর কী মত ছিল– মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব সে বিষয়ে নীরব। মহাভারতীয় এই কাহিনি সুবোধ ঘোষের দৃষ্টিতে নতুন ব্যাখ্যা লাভ করেছে (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৪, ১০৪৩)।

সংবরণ ও তপতী

জনকল্যাণ এবং হিতব্রতের আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেমাকাঙ্ক্ষার এক দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে 'সংবরণ ও তপতী'র কাহিনিতে। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত রাজা সংবরণ সূর্যোপাসক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পরম শ্রদ্ধাসহকারে ধূপ, অর্ঘ্য মাল্যাদিসহ ভাস্করের আরাধনা করতেন। একদিন রাজা সংবরণ মৃগয়া করতে গিয়ে সূর্য কন্যা তপতীকে অবলোকন করেন এবং তাঁর অলৌকিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পাণি প্রার্থনা করলেন। তপতী সংবরণকে নিজ পিতা ভাস্করের নিকট তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাপন করতে বললেন। তখন মহারাজ সংবরণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে পৌরোহিত্যে বরণ করে, তাঁর দ্বারা নিজ মনাভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। বিবাহের পর অমাত্যদের কাছে রাজ্যভার দিয়ে তপতীসহ দ্বাদশবর্ষকাল ভোগ লালসা পরিতৃপ্ত করতে লাগলেন। রাজা সংবরণকে এরকম রাজ্যভার পরিত্যাগপূর্বক, ভোগমুখে মত্ত দেখে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর রাজ্যে বর্ষণ করা থেকে বিরত হলেন। অনাবৃষ্টিতে প্রজাসাধারণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে, অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হতে লাগল। তাই দেখে মহর্ষি বশিষ্ঠ সংবরণকে পরামর্শ দিয়ে পুনরায় স্বরাজ্যে আনয়ন করলেন। রাজা সংবরণ পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করলে, পূর্বের মতো যথাযথ বারিবর্ষণ ও শস্য উৎপন্ন হতে লাগল। তখন মহারাজ সংবরণ সহধর্মিণী সমভিব্যাহারে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ সম্পাদন করলেন (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ১৭৭-১৭৯)।

সুবোধবাবুর মনীষার প্রমাণ এই যে, মূল কাহিনিতে আরও পাঁচটা সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যুগোপযোগী সম্ভাবনাটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাঁহার শিল্পদক্ষতার প্রমাণ এই যে (এখনও যদি প্রমাণের আবশ্যক করে), সেই সম্ভাবনাটিকে হৃদয়স্পর্শী কাহিনীতে পরিণত করিয়াছেন। কথাটি যুগপৎ যুগস্পর্শী ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, ভূমিকা)।

ভাস্কর ও পৃথা

নর-নারী সম্পর্কের নানা চিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত সুবোধ ঘোষ মহাভারতীয় নির্মম কাহিনিকেও পরিবর্তিত রূপদান করেছেন, যার ফলে কাহিনিটি হয়ে উঠেছে হৃদয়গ্রাহী। 'ভাস্কর ও পৃথা' কাহিনি এমনই এক হৃদয়গ্রাহী কাহিনি। মহাভারতের আদিপর্বে পৃথার পরিচয় পাওয়া যায়, যদুশ্রেষ্ঠ শূরের কন্যা পৃথা পালিতা হয়েছেন নিঃসন্তান কুন্তি-ভোজের কাছে। কুন্তী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন, বিষয়টি গোপন রাখতে নবজাতককে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

মহাভারতে পুত্রকে ভাসিয়ে দিয়ে পৃথা লোকলজ্জা থেকে নিজেকে আড়াল করেছেন, সামাজিক অনুশাসনই সেখানে কেন্দ্রীয় সমস্যা। সুবোধ ঘোষের কাহিনিতে পুত্র বিসর্জনের সময়ও পৃথার দৃষ্টিতে ছড়িয়ে আছে অভিমানী প্রেমিকার করুণ আর্তি। অতলস্পর্শী গভীরচারী এক প্রেমিকা চিত্তের আকুতি কাঙ্ক্ষিত পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে চান, সমাজ সংসার তখন তাঁর কাছে মিথ্যে হয়ে যায়। শুধুমাত্র নারীর প্রেম বা পুরুষের প্রেম নয়, নারী-পুরুষ সম্পর্কের মূল তত্ত্বটিকে উপস্থাপন করেছেন 'ভারত প্রেমকথা'র কাহিনিতে (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৬০৭-৬০৯)।

অগ্নি ও স্বাহা

বৈষ্ণবপদাবলীর রাধার মতই কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে পেতে সকল খ্যাতি অখ্যাতি বরণ করে নেন নারী, মানবইতিহাসে এ সত্য চিরকালীন। কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে কৃষ্ণ প্রেমে সুখ লাভ করেন রাধা। এরকম কাহিনিই মহাভারতকে সমৃদ্ধ করেছে।

মহাভারতের মতে, স্বাহা ছিলেন দক্ষের কন্যা। তিনি অগ্নিকে কামনা করে ব্যর্থ হন। অগ্নি এই সময় সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত কামার্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু এই নারীদের পাবেন না বলে তিনি দুঃখে বনে যান। স্বাহা এই সংবাদ জেনে একে একে ছয়জন ঋষির স্ত্রীর রূপ ধারণ করে অগ্নির কাছে যান। সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের মধ্যে বশিষ্ঠ মুনির স্ত্রী অরুন্ধতী ছিলেন তীব্র তাপসিনী। এই কারণে স্বাহা অরুন্ধতির রূপ ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অগ্নির সাথে স্বাহা ছদ্মবেশে মিলিত হন। প্রতিবারের মিলনের পর অগ্নির স্খলিত বীর্য স্বাহা একটি কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। পরে এই কুণ্ড থেকে স্কন্দ (কার্তিকেয়)-এর জন্ম হয়। এই ঘটনার পর ঋষিরা তাঁদের স্ত্রীদের দুশ্চরিত্রা জ্ঞানে ত্যাগ করেন। স্বাহা পরে সব স্বীকার করে নিলে এবং স্কন্দের অনুরোধে ঋষিরা তাঁদের স্ত্রীদের গ্রহণ করেন। স্বাহা অগ্নির সাথে বাস করার জন্য স্কন্দের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে, স্কন্দ বলেন যে-হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদানকালে স্বাহা অগ্নির সাথে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তাঁর অগ্নির সাথে থাকা সম্ভব হবে। অগ্নির ঔরসে স্বাহা তিনটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এরা ছিলেন– পাবক, পবমান ও শুচী। এ ছাড়া অগ্নিবেশ্য নামে আরও একটি পুত্রের কথা জানা যায় (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৫৩১-৫৩২) ।

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন– 'অগ্নির বহুনারী ও পরনারী স্বাদ পূরণের জন্য প্রেমিকা স্বাহার ছদ্মবেশে সে কী কপটাভিনয়! এ কাহিনীটি যেমন করুণ তেমনি মনোরম, তেমনি নাট্যরসে গম্ভীর' (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, ভূমিকা)।

বসুরাজ ও গিরিকা

মহাভারতে বর্ণিত বসুরাজ চেদি দেশের পুরু বংশজাত রাজা। ইন্দ্র তাঁকে সখা গণ্য করে স্ফটিকময় বিমান, অম্লান পঙ্কজের বৈজয়ন্তী মালা এবং বংশনির্মিত যষ্টি দিয়েছিলেন। বিমানে চড়ে আকাশে বিচরণ করতেন বলে উপরিচর বসু নামেও পরিচিত ছিলেন। কোলাহল পর্বত ও শুক্তিমতী নদীর কন্যা গিরিকা ছিলেন তাঁর মহিষী।

তাঁর রাজ্য চেদীর কাছে শক্তিমতী নামে একটি নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন পর্বত কামান্ধ হয়ে শক্তিমতীকে আক্রমণ করে। বসুরাজ পর্বতের এই অন্যায় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাতে সেই পর্বত বিদীর্ণ করলে শক্তিমতী সেই বিদীর্ণ পথ দিয়ে বহির্গত হন। কোলাহল পর্বতের সঙ্গমে এই নদীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। শক্তিমতী পুত্র-কন্যাকে বসুরাজের হস্তে অর্পণ করেন। বসুরাজ সেই পুত্রকে সেনাপতি ও কন্যা গিরিকাকে মহিষী করেন (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৭৩)।

গালব ও মাধবী

মহাভারতের উদ্‌যোগপর্বে গালব ও মাধবীর পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কের মূলে রয়েছে নিষ্ঠাবতী নারীর প্রেম। সংক্ষেপে মহাভারতীয় পুরাণ এরকম– গালব ছিলেন বিশ্বামিত্রের শিষ্য। বিশ্বামিত্র তাঁর কাছে গুরুদক্ষিণা হিসেবে আটশত অশ্ব চেয়েছিলেন যাদের কান্তি হবে চন্দ্র-শুভ্র আর একটি কর্ণ হবে শ্যামবর্ণ। সেই গুরুদক্ষিণা সংগ্রহের জন্য বিষ্ণুকে স্মরণ করলে বিষ্ণুর বাহন গরুড় তাঁকে যযাতির কাছে নিয়ে যান। যযাতি তাঁর কন্যা মাধবীকে গালবের হাতে দিয়ে বলেন যে, মাধবীর শুল্কস্বরূপ গালব নিশ্চয় অন্য রাজাদের কাছ থেকে তাঁর অভীষ্ট আটশত অশ্ব জোগাড় করতে পারবেন। গালবকে সাহায্য করতে মাধবী একে একে অযোধ্যা-রাজ হর্যশ্ব, কাশীরাজ দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরকে দেহদান করে তাঁদের তিন পুত্রের জন্ম দেন। এভাবে গালবের ছয়শত অশ্ব জোগাড় হয়। অবশিষ্ট অশ্ব জোগাড় না করতে পেরে গালব তার পরিবর্তে মাধবীকে বিশ্বামিত্রের হাতে সমর্পণ করেন। বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের জন্ম দিয়ে মাধবী গালবের গুরুদক্ষিণা দেওয়া সম্পূর্ণ করেন। এরপর মাধবীকে যযাতির হাতে প্রত্যর্পণ করে গালব বনে তপস্যা করতে চলে যান। বহুদিন বাদে যযাতি যখন আত্মপ্রশংসা করার জন্য ইন্দ্রের আদেশে স্বর্গচ্যুত হয়ে অন্তরীক্ষে তাঁর চার দৌহিত্রের সঙ্গে ধর্মালাপ করছিলেন, তখন গালবও সেখানে উপস্থিত হন। নিজের তপস্যার পুণ্যফলের একাংশ দিয়ে তিনি যযাতিকে পুনর্বার স্বর্গে যেতে সাহায্য করেন। কাহিনি অংশে মাধবীকে বিক্রিত পণ্য রূপে দেখা যায় (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৭৯২-৭৯৩)।

রুরু ও প্রমদ্বরা

মহাভারতের আদিপর্বের দুটি চরিত্র রুরু ও প্রমদ্বরা। রুরু চ্যবন-পুত্র প্রমতির ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচির গর্ভজাত পুত্র। রুরু স্থূলকেশের পালিতা-কন্যা প্রমদ্বারাকে (ইনি আসলে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু ও অপ্সরা মেনকার কন্যা) দেখে মোহিত হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চান। দুর্দৈবক্রমে বিয়ের কিছুদিন আগে সর্প-দংশনে প্রমদ্বরার মৃত্যু হলো। রুরুর কাতর বিলাপে কৃপা পরবশ হয়ে দেবতারা বলেন যে, রুরু তাঁর নিজের আয়ুর অর্ধেক প্রমদ্বরাকে দিতে

রাজি থাকলে প্রমদ্বরা আবার জীবন ফিরে পেতে পারেন। রুরু তাতে রাজি হন। প্রমদ্বরা জীবন ফিরে পাওয়ার পর রুরু তাঁকে বিয়ে করেন(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ২৬-২৭)।

অনল ও ভাস্বতী

'মহাভারতে'র মাহিষ্মতীর অজেয়তা অংশে যে কাহিনি আছে তাকেই সুবোধ ঘোষ রূপান্তর করেছেন নিপুণ কৌশলে।

মাহিষ্মতী নগরীর রাজা নীল ও তাঁর কন্যা ভাস্বতীর কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে এই আখ্যানে। দিগ্‌বিজয়ে বের হয়ে সহদেব এই নগরী আক্রমণ করলে অনল প্রতিরোধ করে দাঁড়ান। এই অনলকে চোখে না দেখলেও ভাস্বতী পথমধ্যে উপাচার দিয়ে এসেছে (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ২৫৬-২৫৮) ।

ভৃগু ও পুলোমা

দাম্পত্য জীবনে প্রেমহীন ভালোবাসা কিংবা ভালোবাসাহীন প্রেমের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে পারে সন্তান। সম্পর্কের এই গ্রন্থি সর্বকালে, সর্বযুগে সত্য। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে তাকেই আরও একবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সুবোধ ঘোষ। মহাভারতের 'ভৃগু ও পুলোমা'র সম্পর্ক সেই ইঙ্গিত দিয়ে যায়, যা সুবোধ ঘোষের কাহিনিতে পরিপূর্ণ মূর্তিতে ধরা পড়ে।

মহাভারতের আদিপর্বে জানা যায়– এক রাক্ষস, পুলোমা নামক এক নারীকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে, পুলোমার পিতা তাতে সম্মত না হয়ে, মহর্ষি ভৃগুর হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করেন। রাক্ষস এই কথা জানতে পেরে, পুলোমার সন্ধানে ভৃগুর কুটিরে আসেন। ভৃগু তখন সেখানে না থাকায়, অগ্নির কাছ থেকে পুলোমার পরিচয় জেনে নিয়ে রাক্ষস তাকে অপহরণ করেন। এই সময় চ্যবন ঋষি পুলোমার গর্ভে ছিলেন। তিনি গর্ভ্যচ্যুত হয়ে রাক্ষসকে দগ্ধ করেন। ভৃগু গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর অগ্নিকে 'সর্বভুক্ হও' অভিশাপ দেন। এরপর অগ্নি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করেন। ফলে দেবতারা হব্য থেকে বঞ্চিত হতে থাকলে– ব্রহ্মা অগ্নিকে বলেন যে, কেবল গুহ্যদেশের শিখা ও ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক) শরীর সর্বভুক হবে এবং মুখে যে আহুতি দেওয়া হবে, তাই দেবগণের ভাগরূপে গৃহীত হবে (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ২৩-২৫)।

চ্যবন ও সুকন্যা

পুরুষের প্রেম মুগ্ধতার আরো একটি কাহিনি হলো 'চ্যবন ও সুকন্যা'র গল্প। মহাভারতের বনপর্বে আছে– চ্যবন ভৃগুর প্রিয় পুত্র। রাক্ষস যখন ভৃগুর স্ত্রী পুলোমাকে হরণ করছে, তখন দুরাত্মা রাক্ষসের সেই অন্যায় কাজ দেখে চ্যবন মাতৃ-গর্ভ দেখে বেরিয়ে আসেন। চ্যবনের তেজে রাক্ষস পুলোমার দেহ ভস্ম হয়ে যায়। চ্যবনের পুত্র (পত্নী আরুষীর গর্ভজাত) ঔর্বনাম হলেন ক্ষত্রিয় সংহারক পরশুরামের পিতামহ।

মহর্ষি চ্যবন নর্মদা নদীর নিকট বৈদুর্য পর্বতে দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর চক্ষুদুটি ছাড়া সর্ব দেহ বল্মীক, পিপীলিকা ও লতায় আবৃত হয়ে যায়। রাজা শর্যাতি তাঁর রূপবতী কন্যা সুকন্যা ও পত্নীদের নিয়ে যখন ভ্রমণ করতে সেখানে আসেন, তখন সুকন্যা একটি বল্মীকস্তূপের মধ্যে চ্যবনের জ্বলন্ত চক্ষুদুটি দেখে কৌতূহলী হয়ে কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করলেন। চ্যবন তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে যোগবলে রাজা শর্যাতির সৈন্যদের মলমূত্র রোধ করে দিলেন। শর্যাতি তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানলেন যে, সুকন্যা বল্মীকস্তূপে অত্যুজ্জ্বল কোনও বস্তু বিদ্ধ করেছিলেন। শর্যাতি সঙ্গে সঙ্গে বল্মীকস্তূপের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে চ্যবনকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করলেন। চ্যবন বললেন যে, যদি শর্যাতি সুকন্যাকে দান করেন, তাহলেই তিনি ক্রোধ সম্বরণ করবেন। শর্যাতি বাধ্য হয়ে সুকন্যাকে চ্যবনের হাতে সম্প্রদান করলেন।

এর কিছুকাল পরে একদিন অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্নানরতা সুকন্যাকে নগ্নাবস্থায় দেখে তাঁকে বৃদ্ধ চ্যবনকে পরিত্যাগ করে ওঁদের একজনকে বরণ করতে বললেন। সুকন্যা তাঁদের প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে, তিনি চ্যবনের প্রতি অনুরক্ত। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রস্তাব করলেন যে, তাঁরা চ্যবনকে এক রূপবান যুবক করে দেবেন, কিন্তু সুকন্যাকে রাজি হতে হবে যে, যুবক চ্যবন ও অশ্বিনীকুমারদের মধ্যে একজনকে পতিত্বে বরণ করতে। সুকন্যা সে কথা আশ্রমে এসে চ্যবনকে জানাতেই তিনি তাতে সম্মতি দিলেন। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করে যখন সেখান থেকে আবার উঠলেন তখন তিন জনের রূপের মধ্যে কোনও আপাতপার্থক্য রইলো না। কিন্তু সুকন্যা চ্যবনকে চিনতে পেরে– তাঁকেই বরণ করলেন। যৌবন ও স্ত্রীকে পেয়ে চ্যবন প্রীত হয়ে অশ্বিনীকুমারদের বর দিলেন যে, দেবগণের চিকিৎসক হলেও এখন থেকে তাঁদেরও অন্য দেবতাদের মত সোমপানের অধিকার থাকবে(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৪২৫)।

জরৎকারু ও অস্তিকা

'জরৎকারু ও অস্তিকা' কাহিনিতে নারী তাঁর সঙ্কল্পে স্থির থেকে হৃদয়হীন, প্রেমহীন স্বামীকে তার সন্তানের পিতা রূপে বরণ করে নিয়েছেন।

মহাভারতে বর্ণিত জরৎকারু বিখ্যাত মুনি, যিনি পিতৃপুরুষের হিতার্থে নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারুকে বিবাহ করেছিলেন। সূর্যাস্ত যাচ্ছে দেখে একদিন নিদ্রিত জরৎকারুকে তাঁর পত্নী অস্তিকা জাগিয়ে দিলেন যাতে মহর্ষি সন্ধ্যাকৃত্য সময়মত করতে পারেন। কিন্তু জরৎকারু তাতে পত্নীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ত্যাগ করলেন। ব্রহ্মা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর গর্ভে তপস্বী জরৎকারুর যে পুত্র জন্মাবে তিনিই ধার্মিক সর্পগণকে রক্ষা করবেন। জরৎকারু চলে যাবার কিছুদিন পরেই তাঁদের পুত্র আস্তিকের জন্ম হয়(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ২৮-২৯)।

জনক ও সুলভা

'জনক ও সুলভা' কাহিনিতে সমাজ-সংসারের প্রসঙ্গ এসেছে নর-নারীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে।

মহাভারতে বর্ণিত সন্ন্যাসিনী সুলভা মিথিলার রাজা জনকের (তাঁর অন্য নাম ধর্মধ্বজ) খ্যাতি শুনে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য মনোহর রূপধারণ করে তাঁর সভায় উপস্থিত হন। তারপর যোগবলে নিজের বুদ্ধি ও চক্ষু জনকের বুদ্ধি ও চক্ষুতে সন্নিবিষ্ট করলেন। জনক প্রথমে সুলভাকে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অনেক কিছু বললেন। তিনি যে, আসক্তি-মোহ ইত্যাদি ত্যাগ করতে পেরেছেন তা জানালেন। আরও জানালেন যে, তিনি সবাইকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন এবং বিশ্বাস করেন যে, মোক্ষ লাভের সঙ্গে অর্থের কোনও যোগ নেই– শুধু জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। তারপর সুলভাকে প্রশ্ন করলেন, কেন সুলভা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করছেন। জনক ক্ষত্রিয় আর সুলভা ব্রাহ্মণী। তিনি গৃহাশ্রমে আছেন আর সুলভা সন্ন্যাসিনী– তাঁদের দুজনের কখনও মিলন হতে পরে না। সুলভার যদি পতি থাকে, তাহলে তিনি জনকের অগম্যা। অতএব তাঁকে ত্যাগ করে সুলভা যেন চলে যান। সুলভা তখন তাঁকে বললেন যে, জনক যদি সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেন তাহলে তাঁর এই কথাগুলো নিরর্থক। জনক যদি সত্যিই জীবন্মুক্ত হন, তাহলে সুলতার স্পর্শে তাঁর কি অপকার হবে? তিনি পদ্মপত্রে জলের মতই নির্লিপ্তভাবে জনকের দেহে আছেন। সুলভা তাঁকে লিঙ্গপরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে সাধনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সুলভা জনকের স্বজাতি, রাজর্ষি প্রধানের বংশে জন্মেছেন। যোগ্য পতি না পেয়ে মোক্ষ ধর্মের সন্ধানে তিনি সন্ন্যাসিনী হয়েছেন।

সেই ধর্ম জানবার জন্যই জনকের কাছে এসেছেন। তাঁর শরীরে এক রাত্রি শয়ন করে তিনি প্রস্থান করবেন। সুলভা রাজাকে মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ প্রমাণিত করেন(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৪, ৮০৯-৮১১)।

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন– 'সেই যে সুলভা একবার আসিয়া জনকের আত্মজ্ঞানের পরীক্ষা করিয়া গেল! শান্ত সমুদ্রকে উদ্বেল করিয়া চন্দ্রমা যেমন নির্বিকারভাবে অস্তমিত হয়, তেমনি করিয়া সুলভা প্রস্থান করিল। জনক তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, পাঠকও তাহাকে ভুলিবে এমন সম্ভাবনা দেখি না (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, ভূমিকা)।'

দেবশর্মা ও রুচি

মহাভারতের কাহিনিকে আশ্রয় করেই সুবোধ ঘোষ দাম্পত্য জীবনের প্রেম-অপ্রেমের ছবিও এঁকেছেন। মহাভারতের 'দেবশর্মা ও রুচি'র কাহিনিকে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করে নারীর তীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষার এক বিচিত্র রূপ অঙ্কন করেছেন।

দেবশর্মার স্ত্রী রুচির ওপর দেবরাজ ইন্দ্রের লোভ ছিল। রুচি বেশ রূপবতী মেয়ে। তার যে রূপের খ্যাতি আছে সেটা সে জানে। স্বামী দেবশর্মার মত একজন সামান্য পুরুষের পদপ্রান্তে নিজেকে অবনত করে রাখতে চায় না। সে মুক্তি চায়। দূরে পথ প্রান্তের দিকে কারও প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকে সে। স্ত্রীর মনের কথা বোঝে না স্বামী দেবশর্মা ঋষি। এরই নাম ইন্দ্রমায়া। অবশ্য দেবশর্মা নিজেও পত্নীর চরিত্র-দুর্বলতার কথা জানতেন। সেজন্য তিনি যজ্ঞ করতে যাবার সময়ে শিষ্য বিপুলের হাতে স্ত্রীকে রক্ষা করার ভার দিয়ে যান। দেবশর্মা চলে গেলে বিপুল যোগবলে গুরুপত্নী রুচির শরীরে মধ্যে প্রবেশ করে ইন্দ্রের লালসার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করে। রুচির ভেতর এক আমূল পরিবর্তন ঘটে তখন। সে বিপুলের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। বিপুলেরও মন আছে কিন্তু তাই বলে গুরুপত্নীর এই প্রণয় তার কাঙ্ক্ষিত নয়। তাই সে গুরুগৃহ ছেড়ে চলে যায়। তখন রুচি উপলব্ধি করে যে এই রূপ এবং যৌবন প্রমত্ত বসন্তের ছলনা ছাড়া আর কিছুই না(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৪, ৯২০-৯২১) ।

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা

মহাভারতের এক একটি বিষয়, কাহিনি, চরিত্রকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে সুবোধ ঘোষ মূলত নতুন তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন।

অষ্টাবক্র উদ্দালক-কন্যা সুজাতা ও উদ্দালক-শিষ্য কহোড়ের পুত্র। বদান্য ঋষির কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে চাইলে, বদান্য অষ্টাবক্রকে বললেন যে, উত্তর দিকে যাত্রা করে কুবের-ভবন অতিক্রম করে এক রমণীয় বনে পৌঁছে– সেখানে এক তপস্বিনীর সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলে তারপর তিনি তাঁর কন্যাকে দান করবেন। অষ্টাবক্র বহু পথ অতিক্রম করে সেই বনে পৌঁছে এক দিব্য আশ্রমের কাঞ্চনময় ভবনে প্রবেশ করলেন। সেই ভবনে কয়েকটি সুন্দরী নারীর সঙ্গে এক বৃদ্ধা রমণী ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন সেই বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের শয্যায় এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করতেন। অষ্টাবক্রকে লোভ দেখাতেন যে, তাঁর কামনা পূর্ণ করলে তাঁর রমণীয় আশ্রম সমেত সব ধন অষ্টাবক্রের হবে। অষ্টাবক্রের কাছে প্রত্যাখ্যিত হবার পর এক রাত্রে তিনি পরম রূপবতী কন্যায় রূপান্তরিত হয়ে অষ্টাবক্রকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অষ্টাবক্র প্রলোভিত হলেন না। তখন সেই বৃদ্ধা নিজেকে উত্তরদিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে পরিচয় দিয়ে বললেন যে, তিনি বদান্যের অনুরোধে অষ্টাবক্রকে পরীক্ষা করছিলেন। আরও বললেন যে, অষ্টাবক্র যেন মনে রাখেন যে, স্ত্রী জাতি

চপলা এবং স্থবিরা স্ত্রীরও কামজ্বর হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অষ্টাবক্র ফিরে এসে বদান্য-কন্যা সুপ্রভাকে বিবাহ করেন (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৪, ৮৯৮-৯০০)।

ইন্দু ও শ্রুবাবতী

ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের কিছু কিছু জায়গায় প্রেমকে প্রাধান্য দিয়ে একগামিতাকে বেছে নেওয়া হয়েছে যেমন- শল্যপর্বের ইন্দ্র ও শ্রুবাবতী, আদিপর্বে ভৃগু ও পুলোমা, বনপর্বে পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা এবং অগ্নি ও স্বাহা উপাখ্যান। 'ইন্দ্র ও শ্রুবাবতী' কাহিনিতে শেষ পর্যন্ত নারীর প্রেম তপস্যায় পরিণত হয়েছে।

মহাভারতে আছে, ঘৃতাচীকে দেখে মহর্ষি ভরদ্বাজের বীর্যপাত হলে তা তিনি পত্রপুটে ধারণ করেন। এই বীর্যে জন্ম হয় একটি কন্যার, যার নাম শ্রুবাবতী। ইন্দ্রকে বিয়ে করার জন্য তিনি দুস্কর ব্রত নিয়ে তপস্যা করেছিলেন। একশ বছর তপস্যার পর ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে পরীক্ষার জন্য বশিষ্ট সেজে আসেন। শ্রুবাবতী তাঁর সাধ্যমত ঋষির সেবা করতে রাজি হন কিন্তু তাঁর স্ত্রী হতে পারবেন না জানান; কারণ তিনি ইন্দ্রকে চান। বশিষ্টরূপী ইন্দ্র তখন পাঁচটি কুল দিয়ে রান্না করতে বলেন এবং শীঘ্রই তাঁর বাসনা পূর্ণ হবে বলে যান। ইন্দ্র একটি তীর্থে এসে জপ করতে থাকেন যাতে কুল রান্নায় ব্যাঘাত হয়। এদিকে সারাদিনে রান্নার সমস্ত কাঠ শেষ হয়ে যায়, শ্রুবাবতী তখন নিজের দুই পা উনুনের মধ্যে দিয়ে কুল সিদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে নিজের বেশে এসে বর দেন দেহত্যাগ করে স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবেন শ্রুবাবতী (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৪, ৪২৬-৪২৭)।

মানবিক বন্ধনগুলোকে মহাভারতে নির্মমভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সেখানে সম্পর্কের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে ধর্ম, ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং সামাজিক অনুশাসন সেই সম্পর্কগুলোকে মূল্য দিয়ে সুবোধ ঘোষ কাহিনির পুনর্নির্মাণ করেছেন, এখানেই তাঁর নবনির্মাণের সার্থকতা। প্রেমের নিষ্ঠা যে স্বর্গসুখের চেয়ে অধিকতর শ্রেয় এই সত্য প্রমাণ করতেই তিনি এই কাহিনিটি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেন।

ভাষারীতি

'ভারত প্রেমকথা'য় সুবোধ ঘোষের ভাষারীতি একেবারে ভিন্ন। গল্প-উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধের বিষয় ভেদে ভিন্ন ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন তিনি। তাঁর আধুনিক জীবনের গল্পগুলোর ভাষাও আলাদা। এখানে তাঁর ভাষাপ্রবাহ মহাভারতের দেশ-কালে বিস্তারিত, তাই তার জল গভীর, ধ্বনি গম্ভীর এবং কলালাবণ্যে উচ্ছ্রিত শীকরকণায় ইন্দ্রধনুর লীলা। এখানে তাঁর ভাষাপ্রবাহের নির্মল দর্পণে কোথাও বা হিমালয়ের ধবলিমার শুভ্র প্রতিবিম্ব, কোথাও বা প্রাচীন অরণ্যানীর শাখাজটিল অন্ধকারের গূঢ় প্রতিচ্ছায়া, আর কোথাও বা ঐশ্বর্যসুখী রাজরাজন্যগণের বিচিত্রবর্ণ রত্নসৌধচূড়ার প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে প্রেমোপাখ্যানের বর্ণনায় যখন সংলাপ সৃষ্টি করেছেন তাতেও মহাভারতীয় পরিবেশ সৃজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শব্দ চয়নে তিনি তৎসমপন্থী।

উদ্ধৃতিসমূহ থেকে আমরা বুঝতে পারছি ভাষার নিজস্ব একটি মহিমা আছে, ভাষা কেবল ভাবের বাহন নয়। মহাভারতীয় পরিবেশ রচনা এ ভাষারীতি ছাড়া অসম্ভব। সুবোধ ঘোষ বাংলা সাহিত্যে যখনি ক্লাসিকাল রস সৃষ্টি করেছেন তখনই এই ভাষারীতিকে গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। এমন বর্ণাঢ্য, রূপাঢ্য ধ্বনিসুন্দর ভাষা– বাংলা ভাষারই এক নতুন পরিচয় এবং বিপুল উৎকর্ষের সম্ভাবনাময় পথ দেখিয়ে দিয়েছে। আসলে মহাভারতীয় ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য ও কাহিনিকে অভিনব করে তুলতে তিনি যে সমস্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অবশ্যই পাঠক মনকে আলোড়িত করে।

উপসংহার

বস্তুত সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেমকথা' গ্রন্থের কুড়িটি গল্প মহাভারতীয় প্রণয়কাহিনির পুনর্গঠিত বা নবনির্মিত রূপ। প্রতিটি কাহিনি লেখকের রূপান্তর প্রচেষ্টায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে ;যা লেখকের মনীষা ও শিল্পনির্মিতির পরিচয় বহন করছে। নর-নারীর প্রেমের চিরন্তন সত্য উন্মোচনে সুবোধ ঘোষ কুশলী ভাষা বিন্যাসে ও সংলাপ চয়নে আজো জনপ্রিয় কেবল 'ভারত প্রেমকথা' সৃষ্টির কারণে।

তথ্যসূত্র

কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত)। *বনপর্ব, মহাভারত* ১*ম* খণ্ড। কলকাতা: তুলি-কলম, ১৯৮৩।
কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত)। *শান্তিপর্ব, মহাভারত* ১*ম* খণ্ড। কলকাতা: তুলি-কলম, ১৯৮৪।
সুবোধ ঘোষ। *ভারত প্রেমকথা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৬২।